International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.124-132
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i5.2024.124-132

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রথম পর্বে নৃত্যশিক্ষা

ড. পিঙ্কি দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Rabindranath established his school at Santiniketan in 1901. There he emphasized on sports, physical training, dance, song, drawing etc. along with studies. He wanted to introduce an educational system of his own design as opposed to the one introduced by the English. Where student independence will be emphasized. Their education will not be confined to textbooks. They will receive education in the open and generous wilderness of nature. Dance, song, drawing etc. will be the curriculum of their education. It was on this basis that he gave special importance to dance education in his school.

Like painting, Rabindranath's interest in dance was awakened in his later years. In 1920, dance was accepted as a subject of study in the first Santiniketan school and Visva Bharati. In 1924, the dance took place in the first Santiniketan festival. Rabindranath himself was adept at dancing as evidenced by Sita Devi. On the evening of 26 Baisakh, 1911, drama Raja, written by Rabindranath himself, was performed with the students and professors of the school. Many fans from Kolkata came to Santiniketan to watch this performance. Among the arrivals was Sita Devi, daughter of Prabasi Patrika editor Ramanand Chattopadhyay. He wrote about the performance in his memoirs, "The boys' songs were very beautiful. I was fascinated to see the dance of Thakurdarupi Kabibar between them. He could dance beautifully."

In this article we will discuss the aspect of dance education in the first phase of Rabindranath's Brahmacharya Vidyalaya.
Keywords: Rabindranath, Santiniketan, Santiniketan School, Brahmacharya, Dance, Drama, Prabasi, Ramananda Chattopadhyay.

মূল প্রবন্ধ: চিত্রকলার মতো নৃত্যের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ জাগ্রত হয় শেষবয়সে। ১৯২০ সালে প্রথম শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ও বিশ্বভারতীতে নৃত্যকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯২৪ সালে প্রথম শান্তিনিকেতনের উৎসবে নৃত্য স্থান পায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন সীতা দেবীর সাক্ষ্য থেকে একথা জানা যায়। ১৯১১ সালের ২৬ বৈশাখের সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে *রাজা* নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয় দেখতে কলকাতা থেকে অনেক অনুরাগী শান্তিনিকেতনে উপস্থিত

হয়েছিলেন। আগতদের মধ্যে ছিলেন *প্রবাসী* পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় এই অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন, "ছেলেদের গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যবর্তী ঠাকুর্দারূপী কবিবরের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অতি সুন্দর নৃত্য করিতে পারিতেন।"[১]

১৯১৪ সালে বিদ্যালয় বন্ধ হবার আগে শান্তিনিকেতনে *অচলায়তন* অভিনীত হয়। সীতা দেবী নাটকের অন্যতম অভিনেতা পিয়রসন সাহেবের নৃত্য দেখে বলেছেন, "পিয়ার্সন সাহেব শোনপাংশু সাজিয়া কেমন উদ্দাম নৃত্য করিতেছিলেন তাহা এখনও মনে পড়ে।" কালিদাস নাগের স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে, "১৯১১ সালে কবির ৫০ বর্ষপূর্তির উৎসবে তাঁর "রাজা" অভিনয় যখন আমি দেখি, তখন তিনি শুধু সঙ্গীতের মাধুর্যে এবং অভিনয়-নৈপুণ্যেই আমাদের মুগ্ধ করেননি, প্রত্যেকটি গীতাভিনয়ের সঙ্গে নৃত্য-ব্যঞ্জনা যে জাগিয়েছিলেন সে কথা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে; 'ঘুরে লেগেছে তাধিন্ নাধিন্' গানটি নাচের জন্যেই রচিত; 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' কোরাস গাইবার সময় কবি এবং 'আমার সোনার হরিণ চাই' গানে দিনেন্দ্রনাথ গীতের মধ্যে নৃত্যের আভাস দিয়েছিলেন। তারপর অচলায়তন (১৯১২) অভিনয়ে অপাংক্তেয় শোনপাংশুরা, ভারত-মুনির উপযুক্ত পুত্রদের মতই পায়ে পায়ে নৃত্যভাষা রচনা সুর করে কবির শিক্ষারই ফলে। পরলোকগত বন্ধু উইলী পিয়ারসন্ ১৯১৩-১৪ সালে পাশ্চাত্ত্য ছাঁদের নৃত্য অচলায়তনের মধ্যে অবাধে চালিয়ে দেন কবির 'অভয় লাভ করে', সেটাও দেখেছি। ১৯১৬ সালে পিয়ারসন্ 'ফাল্গুনী'র মধ্যেও নেচেছিলেন; এবং সেই সুপ্রসিদ্ধ অভিনয়েই কবি নিজে প্রকাশ্যে প্রথম নাচেন কবিশেখরের অপূর্ব ভূমিকায়, 'চলিগো চলিগো' 'আমায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়' প্রভৃতি গানের অভিব্যক্তি তিনি নূতন মাধুর্যে সার্থক করেন।"[২]

১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে এবং ১৯১৬ তে কলকাতায় *ফাল্গুনী* নাটকের অভিনয় হয়। এর গানের সঙ্গে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ খুবই দক্ষতার সঙ্গে নেচেছিলেন। ১৯১৯ সারে পুজোর ছুটির আগে *শারদোৎসব* নাটকের অভিনয় হয় শান্তিনিকেতনে। সেবার 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' এবং 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' গান দুটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বালকের দল গানের ছন্দ মিলিয়ে পদক্ষেপের দ্বারা সারিবদ্ধ ভাবে মঞ্চ পরিক্রমা করেছিল। বালকদের হাতে ছিল শিউলি ও কাশফুলের ডালা। ১৯২২ এ কলকাতায় *শারদোৎসব* এর রূপান্তর *ঋণশোধ* অভিনীত হল। সেখানেও বালকদের দল একইভাবে মঞ্চ পরিক্রমা করে। ১৯২৩ সালের ফাল্গুন মাসে কলকাতায় *বসন্ত* গীতি নাটিকার সর্বশেষ গান 'ওরে পথিক ওরে প্রেমিক' এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নেচেছিলেন।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত সিলেট এ গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেখানকার অধিবাসীদের আমন্ত্রণে। ২০ কার্তিক বৃহস্পতিবার বিকেলে সিলেটের কাছে মছিমপুর গ্রাম দেখতে যান। সেখানে মণিপুরীদের বাস। গ্রামের মণিপুরী সমাজ কবিকে ছেলেদের রাখাল নৃত্যের মাধ্যমে অর্ভথ্যনা জানায়। রাতে মণিপুরী বালিকারা তাঁর বাংলোতে এসে নাচ দেখিয়ে যায়। এই নাচ দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। তিনি ঠিক করলেন বিশ্বভারতীতে ছাত্রচ ছাত্রীদের জন্য মণিপুরী নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

সিলেট থেকে ফেরবার সময় ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যর আমন্ত্রণে আগরতলায় কিছুদিন অতিথি হিসেবে ছিলেন। সেখানেও অনেক মণিপুরী আছে। আগরতলায় তাদের নাচ দেখলেন। কবি

মহারাজকে অনুরোধ করলেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য একজন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক পাঠাতে। মহারাজার দরবার থেকে বুদ্ধিমন্ত সিংহ কে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হলো। তাঁর সঙ্গে এলো একজন মৃগঙ্গী। বুদ্ধিমন্ত সিংহ এর কাছে নৃত্যশিক্ষার জন্য আট বছর থেকে শুরু করে পনেরো ষোল বছরের একদল ছাত্রকে বাছাই করা হল। শান্তিনিকেতনের ছাতিম তলায় পূর্ব-দক্ষিণ কোণের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রতিদিন বিকালের দিকে এই ক্লাসটি নেওয়া হতো। রবীন্দ্রনাথ তখন দেহলী বাড়িতে থাকতেন। তিনি প্রায়ই আসতেন এই নাচের ক্লাসটি দেখতে। বুদ্ধিমন্ত সিংহকে পাঠানোর জন্য কবি ত্রিপুরার মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখলেন,

> "মহারাজ, বুদ্ধিমন্ত সিংহকে আশ্রমে পাঠাইয়াছেন সেজন্য আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। ছেলেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার নিকট নাচ শিখিতেছে। আমাদের মেয়েরাও নাচ ও মণিপুরী শিল্প কার্য্য শিখিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ যদি বুদ্ধিমন্ত সিংহের স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবার আদেশ দেন তবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আমাদের দেশের ভদ্রঘরের মেয়েরা কাপড়বোনা প্রভৃতি কাজ নিজের হাতে করিতে অভ্যাস করে ইহাই আমাদের ইচ্ছা। এইজন্য আসাম হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী এখানকার মেয়েদের তাঁতের কাজ শিখাইতেছে। কিন্তু শিলেটে আমি মণিপুরী মেয়েদের যে কাজ দেখিয়াছি তাহা ইহার চেয়ে ভাল। আমি বুদ্ধিমন্তের নিকট আমার প্রস্তাব জানাইয়াছি। সে মহারাজের সম্মতি পাইলেই তাহার স্ত্রীকে আনাইয়া এখানকার মহিলাদিগকে মণিপুরী নাচ ও শিল্পকার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে এরূপ বলিয়াছে। এইজন্য এসম্বন্ধে মহারাজের সম্মতি ও আদেশের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।"[৩]

এখানে মেয়েদের নাচ সম্পর্কে আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। সেই সঙ্গে নাচের জন্য চাইলেন এক শিক্ষয়িত্রীকে। কিন্তু বুদ্ধিমন্ত সেবার গরমের ছুটিতে দেশে ফিরে গিয়ে আর শান্তিনিকেতন আসেননি। ফলে নৃত্যশিক্ষার ক্লাসের অবসান ঘটে।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় অভিনীত হল শেষবর্ষণ। সেই নৃত্যাভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যচর্চাকে স্থায়ীভাবে বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান দেবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে আবার মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। ১৯২৫ এর অক্টোবর মাসে মহারাজ মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক হিসেবে নবকুমার সিংহ এবং তাঁর ভাই বৈকুণ্ঠনাথ সিংহকে পাঠালেন শান্তিনিকেতনে। নবকুমার সিংহের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ১৯২৫ সালের শেষ দিকে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। "তদানীন্তন ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মার কাছে কবির নিকট হইতে একট চিঠি আসে। তাহাতে তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের জন্য একজন মণিপুরী নর্ত্তক চাহিয়া পাঠান। সেই সূত্রেই মাস কয়েক পর আমি ও আমার অনুজ বৈকুণ্ঠনাথ শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম।"[৪] উৎসাহিত রবীন্দ্রনাথ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মাকে চিঠিতে লিখলেন, "নাচের শিক্ষক পাওয়া যাবে শুনে খুসী হলুম। মৃদঙ্গ করতাল কলকাতায় কি কিনতে পাওয়া যাবে?"[৫]

নবকুমার বাছাইকরা একদল ছাত্রী নিয়ে নাচের শিক্ষা শুরু করেন। এই দলে ছিলেন গৌরী দেবী, শ্রীমতী দেবী, নন্দিতা দেবী, অমিতা দেবী, যমুনা দেবী প্রমুখ আরো কয়েকজন। ক্লাসটি হতো আড়ালে, শান্তিনিকেতনবাসীদের দৃষ্টির অগোচরে। অমিতা সেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

> "মণিপুরী নাচের কমনীয় ভঙ্গী দেখে রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছিল, মনে হয়েছিল বোধহয় এই

নাচের ভঙ্গীতে তাঁর গানের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হবে। তাই তাঁর আগ্রহে নৃত্যশিক্ষক নবকুমার ঠাকুর [সিংহ] আশ্রমে এলেন। সঙ্গে এলেন তাঁর ছোটো ভাই। এই প্রথম আমাদের তালের নাচ শেখা নিয়মিতভাবে শুরু হল। দেহলী বাড়ির পাশে নতুন বাড়ির পশ্চিমের বড় ঘরে প্রতিদিন বিকেলে আমাদের নাচের ক্লাস হত। মণিপুরীদের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত এই নৃত্য। তাই প্রথমদিনে ওঁরা আমাদের মধ্যে একজনকে কৃষ্ণ একজনকে রাধা সাজিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের বন্দনা করে তবে শুরু করেছিলেন নৃত্যশিক্ষাদান। ছোটো ভাই এক কোণে বসে বাজান খোল। তাঁর হাতে খোলে বেজে ওঠে মিঠে মিঠে নৃত্যের বোল, আর নবকুমার ঠাকুর [সিংহ] মুখে বোল বলেন আর সঙ্গে পায়ের তালের ছন্দ ও হাতের ভঙ্গী শেখান। রাধা কৃষ্ণের গান করেও নাচ শেখান, তাঁর সঙ্গে আমরাও সেই গান করি আর নাচ করি।”[৬]

নভেম্বর মাসে তদানীন্তন বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন শান্তিনিকেতন এলে তাঁকে মণিপুরী নাচের অনুষ্ঠানের দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেদিন মণিপুরী রাসলীলার কিছু অংশ নৃত্যের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছিল।[৭]

১৩৩৩ এর ২৫ বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিমা দেবী স্থির করেন যে সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের দিয়ে ‘কথা ও কাহিনী’ কাব্যগ্রন্থের ‘পূজারিণী’ কবিতাটি অবলম্বনে নবকুমারের সহায়তায় নৃত্য সহযোগে একটি মূকাভিনয় করাবেন। এই থাকবে আবৃত্তি ও গানের সঙ্গে মূকাভিনয়। কবি সেকথা শুনে কবিতাটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটকে রূপান্তরিত করবার কাজে হাত দিলেন চৈত্র মাসের শেষের দিকে। তৈরি হল ‘নটীর পূজা’। কবি নিজে ছাত্রীদের নির্বাচন করে তাদের অভিনয় শেখানো এবং মহড়া পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। দিনেন্দ্রনাথের উপর গানের দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। প্রতিমা দেবী ও নবকুমার গানের সঙ্গে নৃত্য রচনার ভার নিলেন। মহড়া চলাকালীন ১৪ বৈশাখ (১৩৩৩) প্রমথ চৌধুরীকে চিঠিতে লিখছেন,

> “একটা নাটক আমার সমস্ত মন এবং অবকাশ অধিকার করে বসেচে। আগামী ২৫ শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে এই হচ্ছে ফরমাস। তাগিদে পড়ে লিখ্‌তে সুরু করেছিলেন কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরিক তাগিদ তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে সময় মতো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।”[৮]

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ কবির জন্মদিনে অভিনীত হল *নটীর পূজা* নৃত্যনাট্য। প্রতিমা দেবী নবকুমারের সহায়তায় ছাত্রীদের নির্বাচন করে, অভিনয় শিখিয়ে, মহড়া পরিচালনা করে এই অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন। কোনার্ক বাড়িতে এর অভিনয় হয়। গৌরী দেবীর মণিপুরী নৃত্য সহযোগে শ্রীমতীর আত্মনিবেদনের অভিনয় সেদিন সকলের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।[৯] শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এই অভিনয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। পেশাদার অভিনেত্রীর পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের সাহসে সর্বপ্রথম শিল্পী নন্দলাল বসুর কন্যা, বিদ্যালয়ের ছাত্রী গৌরী *নটীর পূজা* তে নটীর ভূমিকা পালন করে। আশ্রমের প্রথম পর্বে এটি ছিল দারুণ সাহসী পদক্ষেপ। নবকুমার সিংহ রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের ‘গমক’ প্রথাটির উপরেই বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং খোলের বোলের সঙ্গে দলবদ্ধ নাচও শিখিয়েছিলেন। এইভাবে রবীন্দ্রগানের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র নৃত্য প্রথা নবকুমারের শিক্ষকতায় নটীর পূজার অভিনয় থেকে শান্তিনিকেতনে প্রথম প্রবর্তিত হয়।[১০]

কলকাতা থেকে আগত দর্শকেরা 'নটীর পূজা' অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে কবিকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন নাটকটিকে কলকাতায় মঞ্চস্থ করবার জন্য। কিন্তু তখনই সেভাবে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি কারণ ১৯২৬ এ কবি ইউরোপ ভ্রমণে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে আবার 'নটীর পূজা' নিয়ে পড়লেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথও অর্থ সংগ্রহের জন্য এই প্রস্তাব কবির কাছে দেন। (২০ পৌষ ১৩৩৩ এ রানী মহলানবীশকে লেখা চিঠিতে এর সাক্ষ্য পাচ্ছি। সেখানে তিনি লিখছেন, "...রথীর প্রস্তাব এবার ১১ মাঘের দুই একদিন পরেই কলকাতায় নটীর পূজার অভিনয় করে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করা হয়।"[১১]) ফলে কলকাতায় নটীর পূজা অভিনয়ের ব্যাপারটি ক্রমশ এগোতে থাকে। ২৭ পৌষ (১৩৩৩) রানীকে লিখলেন,

> "নটীর পূজা অভিনয়ের প্রস্তাব উঠেচে। গৌরীর বিবাহের পূর্বেই কাজটা সারা চাই। অর্থাৎ আগামী ১৫ ই মাঘের মধ্যেই চুকিয়ে দিতে হবে। দুই একজন প্রধান পাত্রের অভাব - যথা লাবী ও অমিতা। এই ফাঁক ভরাবার জন্যে কন্যা খুঁজে বেড়াচ্চি। অর্থাৎ আমার অবস্থা ঠিক কন্যাদায়ের উলটো - আমার হল নাটকের পাত্রদায় - কন্যাই দুর্লভ। ভরসা আছে একরকম করে চলে যাবে। আশা করচি এত ভালো হবে যে তোমরা দেখতে পেলে না বলে তোমাদের চিরকাল পরিতাপ থাকবে।"[১২]

১৯২৭ এর ১৭ জানুয়ারি রানী মহলানবিশকে চিঠিতে তিনি লিখলেন,

> "তোমাকে লিখেচি নটীর পূজার রিহার্সাল চলচে। ভালোই হচ্চে। কিন্তু মনে ভয় আছে, পাছে আমার চিরপরিচিত ভারতীয় অদৃষ্ট আমার সঙ্গে কঠিন কৌতুক করতে প্রবৃত্ত হন। এখনি তার কালো মুখোসটা পরে তিনি আমাকে ভয় দেখাতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই মাসের সুরুতেই বৃষ্টি বাদলের অকাল উপদ্রব দেখা দিয়েচে। আজও স্তবকে স্তবকে কালো মেঘে আকাশটা যেন পাগলের মতো আলুথালু হয়ে রয়েচে। আমাদের অভিনয়ের দিন যদি দুর্যোগের অবসান না হয় তা হলে - থাক, আগে থাকতে কল্পনায় বিভীষিকা রচনা করে লাভ নেই।"[১৩]

নটীর পূজার অভিনয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। পুজোর দালানের খোলা প্রাঙ্গণের উপর মেরাপ বেঁধে। ফলে কবির দুশ্চিন্তা ছিল খুবই। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮ মাঘ আবার অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয়ের স্মৃতিচারণা করে অমিতা সেন লিখেছেন,

> "দর্শকের সামনের সারিতে রয়েছেন সন্তোষ বাবু ও আমাদের নবদা। তাঁদের ডাইনে বাঁয়ে রয়েছেন গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। ভঞ্জ মশাই-এর একপাশে রয়েছেন জগদীশ চন্দ্র বসু, অন্যপাশে তদানীন্তন বাংলার সাহেব গভর্নর।"[১৪]

এখানে একটি নতুন দৃশ্য কবি যুক্ত করেন। দৃশ্যটি হচ্ছে নাটকের ভূমিকা। এতে আছে ভিক্ষু উপালীর সঙ্গে শ্রীমতীর কথাবার্তা। গুরুদেব নিজে উপালীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাটকের শেষে তিনি আবার ভিক্ষু উপালী হিসেবে প্রবেশ করে শ্রীমতীর মৃতদেহে পুষ্পার্ঘ প্রদান করেছিলেন।[১৫]

অভিনয়ের সাফল্যে কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। রানীকে লেখা চিঠিতে বলছেন,

> "নটীর পূজা যে কলকাতার লোককে কি রকম উতলা করে তুলেচে তা নিশ্চয়ই বুলা প্রভৃতির চিঠিতে শুনেছ। টিকিট কেনবার ভিড়ে দরজা ভাঙাভাঙির ব্যাপার বেধে ছিল। ইচ্ছে কররে আরও

২০/২৫ দিন এই রকম পূর্ণ বেগে ব্যবসা চালাতে পারা যেত। কিন্তু হায়রে, আসচে রবিবারে গৌরীর বিয়ে। ব্যস্ হয়ে গেল। এমন সুন্দর দৃশ্য আর কেউ কখনও দেখতে পাবে না।”[১৬]

১৯২৬ সাল নাগাদ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষালাভের জন্য আসেন মাদ্রাজের থিওসফিক্যাল সোসাইটির এক ছাত্র বাসুদেব। তাঁর জন্মস্থান কোয়েম্বাটুর। তিনি দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যমের ঢং এ সামান্য কিছু নাচ জানতেন। রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর উৎসাহে বাসুদেব শান্তিনিকেতনে কয়েকটি নৃত্যানুষ্ঠানে গুরুদেবের গানের সঙ্গে নাচে অংশগ্রহণ করেন। সে যুগে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা মণিপুরী পদ্ধতিতে মেয়েদের নাচ দেখতে অভ্যস্ত ছিল। ফলে বাসুদেবের নতুন ধরণের পুরুষোচিত নাচে সকলেই আকৃষ্ট হয়। কলাভবনের শিক্ষা সমাপ্ত করে বাসুদেব চলে গেলেও ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রায় সব কটি নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে আনা হতো।

বাসুদেবের নাচের প্রভাবে শান্তিনিকেতনে কিছু যুবকের মনে নৃত্যচর্চার প্রতি উৎসাহ জন্মায়। তাঁদের মধ্য অন্যতম ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। কিন্তু পুরুষদের উপযোগী নাচ কি আছে? কোথায় কীভাবে সেই নাচ শেখা যায় এ সমস্ত তথ্য তাঁর কাছে ছিল না। উৎসাহিত হয়ে তিনি এ সম্বন্ধে খোঁজ করতে আরম্ভ করেন। এই খোঁজের ফলে তাঁর হাতে আসে ১৯৩১ সালে মাদ্রাজের ‘মিউজিক অ্যাকাডেমি’ থেকে প্রকাশিত তাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কেরলের নৃত্যাভিনয় ও লোকনৃত্য বিষয়ে একটি পূর্ণ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ পড়ে তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে পুরুষনৃত্য অনুশীলনের একমাত্র উপযুক্ত স্থান হল কেরল। আরও বিস্তারিত খবরের জন্য তিনি ত্রিবান্দ্রমবাসী শান্তিনিকেতনের এক প্রাক্তন ছাত্রকে চিঠি লেখেন। তারপর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুমতি নিয়ে কেরলের অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি মাদ্রাজে দুদিন থাকেন। তারপর ত্রিবান্দ্রম শহরের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তা ভুল করেন এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ত্রিচুরের অনুজান্ অচ্চামের কাছে উপস্থিত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় মূরকুননাথকাবো গ্রামে গিয়ে ‘কেরালাকলামণ্ডলম’ বিদ্যালয়ে কথাকলি শেখবার উদ্দেশ্যে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনমাস শিক্ষালাভের পর তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। গুরুদেবের সঙ্গে এই নাচ নিয়ে তাঁর বিস্তারিত আলোচনাও হয়। ‘এই হল শান্তিনিকেতনে কথাকলি নাচের প্রথম সূত্রপাত।’[১৭] এই বক্তব্যের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আগত মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক নবকুমার সিংহের মত মিলছে না। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শেখাতে আসেন ১৯২৫ সালের শেষের দিকে তখন দক্ষিণী কথাকলি নৃত্যশিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলছেন (“শান্তিনিকেতনে প্রথম আসার পর দেখিয়াছিলাম, সেখানে কেবলমাত্র দক্ষিণী ‘কথাকলি’ নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।”[১৮]) এই কথাকে ধরলে একথা বলা যায় যে শান্তিদেব ঘোষের কথাকলি নৃত্যশিক্ষার অনেক আগেই শান্তিনিকেতনে দক্ষিণী কথাকলি নৃত্য শিক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিদেবকে কেরালা কলমণ্ডলমে কবি ভালাথোলের কাছে পাঠিয়েছিলেন একটি কথাকলি নাচিয়েকে নির্বাচন করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসার জন্য। কবি ভালাথোল শ্রীকেলু নায়ারকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। কেলু নায়ার শান্তিনিকেতন এসে কথাকলি নাচের সঙ্গে মণিপুরী নাচের মিশ্রণ ঘটিয়ে ধীরে ধীরে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। গুরুদেবের শেষজীবনে রচিত সবকটি নৃত্যনাট্যের প্রধান চরিত্রে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্য পরিচালনার জন্য মূলত প্রতিমা দেবীর উপর নির্ভর করেছিলেন। ১৯২৯ সালের ৭ মার্চ তিনি প্রতিমা দেবীকে চিঠিতে লিখছেন,

"... ওখানকার ছাত্রীদের পরে দৃষ্টি রাখা তোমার কর্তব্যের অঙ্গ হওয়া কর্তব্য। এ অধিকার তোমার স্বাভাবিক অধিকার।... এতদিনে ওদের নাচ শিক্ষার পালা বোধ হয় আবার আরম্ভ হয়েছে। যদি নটীর পূজা ওদের দিয়ে করাতে পার তো খুব ভালো হয়। রাজা ও রাণী আমি তো ছেঁটে ছুঁটে মেজে ঘষে ঠিক করে দিয়ে এলুম, কি রকম অভিনয় হবে জানি নে। কিন্তু আমি যদি এটাকে তৈরি করবার ব্যাপারে হাত দিতে পারতুম তাহলে এটা খুব ভারো হত। ফিরে গিয়ে যদি সুযোগ হয় দেখা যাবে।"[১৯]

১৭ মার্চ (১৯২৯) লিখলেন,

"পাঁজিতে দেখলুম ১১ ই চৈত্রে দোলপূর্ণিমা। আর তো দেরি নেই - এবারে তোমাদের উৎসব থেকে বঞ্চিত হলুম। তোমরা কি কিছু অভিনয়ের চেষ্টা করচ? নতুন মেয়েদের নিয়ে নটীর পূজা যদি করতে পার ত বেশ ভালো হয়। রাজা ও রাণী অভিনয় কি তোমরা দেখেচ? আমার আপশোষ হচ্চে ওটা আমরা ত করতে পারলুম না। সংশোধিত বই এক কপি যদি পাই তাহলে তর্জ্জমা করে দিই, নিশ্চয় লাগ্‌বে। শান্তিনিকেতনের মেয়েদের দেখবার কর্ত্তৃত্ব তোমরা যদি নিতে পার তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"[২০]

শান্তিনিকেতনের জীবনধারার সঙ্গে প্রতিমা দেবী নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে তিনি ১৯৩০ সালে *নবীন* অভিনয়ের সময় অনেকগুলি গানের সঙ্গে নৃত্যের পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌয়ের মরিস কলেজের সাংবৎসরিক উৎসবে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীরা কোনো নৃত্যাভিনয় প্রযোজনা করুক এই মর্মে প্রতিমা দেবীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এই উৎসবের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রতিমা দেবী তখন অসিতকুমার হালদারের অতিথি রূপে লক্ষ্ণৌতেই ছিলেন। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে জানানো হলে তিনি স্থির করেন লক্ষ্ণৌতে *নবীন* ও *শাপমোচন* এর নৃত্যাভিনয় হবে। সেই অনুযায়ী একটি দল শান্তিনিকেতন থেকে রওনা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৩)। লক্ষ্ণৌতে ২ মার্চ *নবীন* এবং ৬ ও ৭ মার্চ *শাপমোচন* অভিনীত হয়েছিল তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায়। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখলেন (মার্চ ১৯৩৩),

"নবীন ভালো রকম উৎরেচে শুনে খুসি হলুম। শাপমোচন সম্বন্ধে উদ্বেগ আছে। পড়বে কে? সগার? তাহলে কি শাপের মোচন হবে, না সেটা আরো জড়িয়ে ধরবে। স্বর্গে তালভঙ্গ হয়েছিল বলেই তো অভিশাপ, তোমরা মর্ত্ত্যে যদি সেই কীর্ত্তি কর তাহলে তো উদ্ধার নেই। একবার ভাবলুম সুরেনের দলে জুটে স্বয়ং ওখানে অবতীর্ণ হই। এখানে নানা কাজ আছে বরে হয়ে উঠ্‌ল না।"[২১]

এই বছরের (১৯৩৩) নভেম্বরের শেস সপ্তাহে বোম্বাইয়ে রবীন্দ্র সপ্তাহ পালিত হয়। সেখানে ২৫ নভেম্বর *শাপমোচন* এবং ২৮ নভেম্বর *তাসের দেশ* অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবীকে লিখলেন,

"প্রথমে শাপমোচন দিয়ে আরম্ভ করা গেল। খুবই জমেছিল, এখানকার কাগজে যেরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে আমাদের দেশে কোনোদিন তেমন ঘটে নি। তার পর তৃতীয়দিন তাসের দেশ। থার্ম্মোমিটর একেবারে সাব্ নর্ম্মাল। দমে গেল মন। সকালে উঠেই নতুন নাচ গান ঢুকিয়ে তাসের দেশকে সম্পূর্ণ করে তোলা গেল। আশ্চর্য্য এই যে আয়ত্ত করতে মেয়েদের কিছুমাত্র বিলম্ব হোলো না। "সঙ্কোচের বিহ্বলতা" গানটাতে যে নাচ ওরা লাগিয়েচে সেটা নতুন ধরণের - সেটাতে খুব

encore পেয়েচে - বুড়ী আশ্চর্য্য করে দিয়েচে সবাইকে। আবার কাল হবে শাপমোচন। কিন্তু নতুন তাসের দেশটা শাপমোচনের চেয়ে ভালো হয়েছে। তাতে রোমান্স্ এবং রিয়ালিজম্ পাশাপাশি থাকাতে আশ্চর্য্যরকম জমেচে।”[২২]

রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকে শিক্ষিতজনের কাছে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একাজে তাঁর অন্যতম সহায়ক হয়েছিল নৃত্যনাট্যগুলি। সেগুলি বাংলার বাইরে যেভাবে সুধীজনের, রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা কবিকে আনন্দ দিয়েছিল। এ আনন্দ স্রষ্টার আনন্দ, তাঁর কাজের মূল্যায়নের আনন্দ। বাংলার বাইরে নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান কতদূর সফল হয়েছিল উপরোক্ত চিঠি দুটি তার দৃষ্টান্ত।

সংগীতের মতো রবীন্দ্রনৃত্যেও ভাব প্রকাশের প্রয়োজনীতার দিক থেকেই নৃত্যের বিভিন্ন রীতি গৃহীত হয়েছিল। নৃত্যশিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। বাঙালি ভদ্রঘরের মেয়েদের পরিশীলিত নাচের পরিসরটিও তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। নাচকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করলেন, বাঙালির সংস্কৃতিরও প্রসার ঘটালেন।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ শান্তিদেব, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ২০১৫, পৃ ৫।
২. তদেব, পৃ ৫-৬।
৩. রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি, আগরতলা, মে ২০১১, পৃ ৩২৮।
৪. ঠাকুর নবকুমার সিংহ, ‘স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি’, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি, আগরতলা, মে ২০১১, পৃ ১৮৩-১৮৪।
৫. ঘোষ শান্তিদেব, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, পৃ ২০।
৬. সেন অমিতা, আনন্দ সর্বকাজে, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৬ জুন ২০১৭, পৃ ৭৪।
৭. ঘোষ শান্তিদেব, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, পৃ ১৯-২০।
৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৫, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪২২, পৃ ২৮১-২৮২।
৯. ঘোষ শান্তিদেব, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, পৃ ২২।
১০. তদেব, পৃ ২৭।
১১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, নিজের কথা, নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অর্ধসহস্র চিঠি, সংকলন ও সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২২ শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ ৫১।
১২. নিজের কথা, পৃ ৫৩।

১৩. নিজের কথা, পৃ ৫৫।
১৪. ঘোষাল বিজন, রবিজীবন ১৩৩৩-৩৪, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ ১১৮।
১৫. ঘোষ শান্তিদেব, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, পৃ ২৩।
১৬. নিজের কথা, পৃ ৫৯।
১৭. ঘোষ শান্তিদেব, নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ ৮৬-৯০।
১৮. সিংহ নবকুমার, 'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি', রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পৃ ১৮৫।
১৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১০, পৃ ৯৮-৯৯।
২০. তদেব, পৃ ১০০।
২১. তদেব, পৃ ১২৯।
২২. তদেব, পৃ ১৩০।